بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৯ জানুয়ারি, ২০২৪ মোতাবেক ১৯ সুলাহ্, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

উহুদের যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত আছে। এ প্রেক্ষিতেই আরও কিছু কথা বর্ণনা করব। বর্ণিত হয়েছিল যে শত্রুরা ঘোষণা করে, মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। মহানবী (সা.)-এর শাহাদাতের এই যে সংবাদ ছড়িয়েছিল, মুসলমানরা যখন তা শোনে তখন মুসলমানদের অবস্থা কেমন হয়েছিল– এর বিস্তারিত বর্ণনায় লেখা আছে, যখন ইবনে কামিয়ার ধারণা হলো , সে মহানবী (সা.)-কে শহীদ করে ফেলেছে তখন সে ঘোষণা করে দেয়, মুহাম্মদ (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। আর এটিও বলা হয় যে, ঘোষণাকারী ছিল শয়তান, যে জুআল অথবা জুআয়েল বিন সুরাকার চেহারায় ছিল। জুআল প্রারম্ভিক সৎ মুসলমানদের একজন ছিলেন এবং সুফ্ফাবাসীদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার নাম মহানবী (সা.) পরিখার যুদ্ধের সময় পরিবর্তন করে উমর রেখেছিলেন। যাহোক একথা শুনে মানুষ হত্যা করার উদ্দেশ্যে জুআল-এর দিকে ছুটে যায়। কিন্তু তিনি এই ঘোষণার কথা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, আমি তো কোনো ঘোষণা করি নি। খাবাত বিন জুবায়ের এবং আবু বারদাহ্ সাক্ষ্য দেন, যখন এই ঘোষণা হয়েছে তখন তিনি তার কাছে এবং পাশেই যুদ্ধ করছিলেন। অর্থাৎ তিনি এই সাক্ষ্য দেন যে, তিনি তো আমার সাথেই লড়াইরত ছিলেন; অর্থাৎ আমার সাথি হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, এই ঘোষণাকারী আযাব্বুল আকাবা ছিল যে তিনবার ঘোষণা করেছে যে, মুহাম্মদ (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। এই ঘোষণা কে করেছিল, সেসম্পর্কে বেশ কয়েকটি উক্তি রয়েছে। হতে পারে, বিভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখেছে আর বিভিন্ন মানুষ (ঘোষণা) করে থাকবে। অর্থাৎ ইবনে কামিয়া, ইবলীস এবং আযাব্বুল আকাবা'র মধ্য থেকে সবাই ঘোষণা করে থাকবে। যে কোনো শয়তানী প্রকৃতির মানুষই এই ঘোষণা করতে পারে। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই মুসলমানদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলে, এখন যেহেতু আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন তাই তোমরা নিজেদের জাতির কাছে ফিরে চল, তারা তোমাদের নিরাপত্তা দেবে। এ কথা শুনে অন্য কয়েকজন বলেন, যদি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) শহীদ হয়ে থাকেন তাহলে তোমরা কি শহীদ হয়ে নিজেদের প্রভুর কাছে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের নবী (সা.)-এর ধর্ম এবং তাঁর বাণীর জন্য যুদ্ধ করবে না? হযরত সাবেত বিন দাহদাহ্ আনসারদের বলেন, হে আনসারদের দল! মুহাম্মদ (সা.) শহীদ হয়ে গেলেও আল্লাহ্ তা'লা চিরঞ্জীব, তাঁর কোনো মৃত্যু নেই! অতএব নিজ ধর্মের জন্য যুদ্ধ

করো। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের বিজয় ও সফলতা দান করবেন। একথা শুনে আনসারী মুসলমানদের একটি দল দণ্ডায়মান হয় আর তারা হযরত সাবেত-এর সঙ্গী হয়ে মুশরিকদের সেই দলের ওপর হাল্লা করে যাতে খালিদ বিন ওয়ালীদ, ইকরামা বিন আবু জাহল আর আমর বিন আস এবং যিরার বিন খাত্তাব ছিলেন। মুসলমানদের এই ছোট্ট দলটিকে আক্রমণ করতে দেখে খালিদ বিন ওয়ালীদ তাদের ওপর প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ করেন আর সাবেত বিন দাহদাহ্ এবং তার আনসারী সঙ্গীদের শহীদ করেন।

এই বিশৃঙ্খল অবস্থা সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে যা লিখেছেন তা এরূপ,

তখন মুসলমানরা তিনভাগে বিভক্ত ছিল। একটি দল ছিল তাদের যারা মহানবী (সা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ শুনে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই দলটি ছিল সবচেয়ে ছোটো। তাদের মাঝে হযরত উসমান বিন আফ্ফানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু যেমনটি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে যে, তখনকার বিশেষ পরিস্থিতি আর তাদের আন্তরিক ঈমান ও নিষ্ঠাকে দৃষ্টিপটে রেখে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাদের মাঝে কতক মদীনা ফিরে যান আর এভাবে মদীনায়ও মহানবী (সা.)-এর কল্পিত শাহাদত এবং ইসলামী সৈন্যবাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছে যায়। যার ফলে পুরো শহরে এক প্রকার হৈচৈ শুরু হয়ে যায় এবং মুসলমান আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত অবস্থায় শহর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং উহুদের দিকে রওয়ানা দেয়। আর (তাদের মাঝে) কতক তো দ্রুতবেগে দৌড়াতে দৌড়াতে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে যায় এবং আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে শত্রুদের সারিতে প্রবেশ করে; অর্থাৎ তারা যুদ্ধ আরম্ভ করে দেয়। দ্বিতীয় দলে ছিল তারা যারা না পালালেও মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের সংবাদ শুনে হয় মনোবল হারিয়ে বসেছে অথবা তখন আর লড়াই করাকে অনর্থক মনে করছিল। এ কারণে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এক দিকে সরে গিয়ে মাথা হতোদ্দম হয়ে বসে পড়েছিল। তৃতীয় দল ছিল তারা যারা অনবরত যুদ্ধ করে যাচ্ছিল। তাদের মাঝে কিছু এমন লোক ছিল যারা মহানবী (সা.)-এর আশেপাশে সমবেত ছিল আর আত্মবিলীনতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করছিল। আর অধিকাংশ ছিল তারা যারা রণক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে লড়াই করছিল। তারা এবং দ্বিতীয় দলের লোকেরা যতই মহানবী (সা.)-এর জীবিত থাকার সংবাদ পেতে থাকে ততই তারা উন্মাদপ্রায় লড়াই করতে করতে তাঁর (সা.) চারপাশে একত্রিত হতে থাকে। সে সময় যুদ্ধের অবস্থা এরূপ ছিল যে, কুরাইশ সৈন্যবাহিনী যেন সমুদ্রের ভয়াল ঢেউয়ের ন্যায় চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সবদিক থেকে তির এবং পাথর বর্ষিত হচ্ছিল। নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীরা এ বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখে মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে বেষ্টনি গড়ে তাঁর পবিত্র দেহকে নিজেদের দেহ দ্বারা আড়াল করেন। কিন্তু এর পরও যখনই আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতো তখন এই গুটিকতক ব্যক্তিকে এদিক-সেদিক বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। এমতাবস্থায় কখনো কখনো মহানবী (সা.)

প্রায় একাই থেকে যেতেন। এমনই কোনো এক সময়ে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস-এর মুশরিক ভাই উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস-এর একটি পাথর তাঁর (সা.) পবিত্র চেহারায় লাগে যার ফলে তাঁর একটি পবিত্র দাঁত ভেঙে যায় এবং ঠোঁটও ক্ষতবিক্ষত হয়। কিছুক্ষণ পরই আরেকটি পাথর, যা আব্দুল্লাহ্ বিন শিহাব নিক্ষেপ করেছিল, তাঁর (সা.) কপালে আঘাত হানে। আরও কিছুক্ষণ পর তৃতীয় একটি পাথর, যা ইবনে কামিয়া নিক্ষেপ করেছিল, তাঁর (সা.) পবিত্র গালে এসে আঘাত করে যার ফলে তাঁর শিরস্ত্রাণের দুটি আংটা তাঁর গালে বিদ্ধ হয়ে যায়। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস তার ভাই উতবার এ কাজের ফলে এতটা রাগান্বিত হয়েছিলেন যে, তিনি বলতেন, কখনো কোনো শত্রুকে হত্যার জন্য আমি এতটা উত্তেজনা বোধ করি নি যতটা আমি উহুদের দিন উতবাকে হত্যা করার জন্য উত্তেজিত ছিলাম।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দোয়া গৃহীত হওয়ার দর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে বিস্তারিতভাবে উহুদের এ ঘটনারও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

আমি যে একথা বলেছি যে, ইংরেজ জাতি যদি প্রকৃত অর্থে একত্ববাদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমার কাছে দোয়ার আবেদন করে তাহলে তারা বিজয়ী হবে। (এটি ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের কথা।) তিনি বলেন, যদি তারা আমার কাছে দোয়ার আবেদন করে তাহলে তারা বিজয়ী হবে। এটি খোদা তা'লার বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী, তাঁর কিতাব এবং আমার বিভিন্ন স্বপ্নের সাথে একান্ত সামঞ্জস্য রাখে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ জাতির জন্য অনেক দোয়া করেছেন। কিন্তু এসব লোক খোদা তা'লার আসনে এক বান্দাকে বসিয়েছে। তাই খোদা তা'লা তাদেরকে পরীক্ষায় নিপতিত করছেন। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-কে তারা খোদার পুত্র বানিয়ে রেখেছে, তাই তারা পরীক্ষায় নিপতিত। তাদের জন্য অনেক দোয়া করা হয়েছে। অতঃপর তিনি লাহোরীদের কথা উল্লেখ করেন যে, লাহোরীরা অস্বীকার করতে চাইলে নির্দ্বিধায় করুক; {অর্থাৎ লাহোরীদের দৃষ্টিভঙ্গি তার চেয়ে ভিন্ন যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করছেন।} যাহোক, তিনি (রা.) বলেন, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদের সম্পর্কে যেসব দোয়া করেছেন তা গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে তাদের শির্ক। যদি এই প্রতিবন্ধকতা আংশিক কিংবা পুরোপুরি দূর হয়ে যায় তাহলে এসব দোয়া তৎক্ষণাৎ গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করবে। আমি এমন অনেক স্বপ্ন দেখেছি যে, আমার দোয়ায় তাদের বিপদাপদ দূর হতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমি যে দোয়াই করি তা অবশ্যই কবুল বা গৃহীত হয়। এ বিষয়টি যদি আমার আয়ত্বে থাকতো তাহলে আমি সেসব কষ্টক্লেশ অবশ্যই এড়াতে পারতাম যার সম্মুখীন আমরা হই। পবিত্র কুরআনে আছে, কাফিররা মহানবী (সা.)-কে বলত, **তুমি যদি খোদা তা'লার এতই প্রিয় হয়ে থাকো তাহলে তোমার অমুক কাজ কেন হয়ে যায় না? কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! (তুমি) তাদেরকে বলে দাও, যদি আমার নিয়ন্ত্রণে থাকত তাহলে আমি প্রভূত কল্যাণ আমার নিজের জন্যই একত্র করে নিতাম।**

অতএব, মহানবী (সা.)-এর জন্যই যদি তাঁর সকল দোয়া কবুল হওয়ার বিধান না থাকে তাহলে আমার বেলায় কীভাবে হতে পারে? মহানবী (সা.)-এর জন্যও যেখানে বিধান এটিই ছিল যে, খোদা তা'লা যদি দোয়া গ্রহণ করতে চাইতেন আর কোনো নিদর্শনের মাধ্যমে তাঁর সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন কেবল তবেই সেই (দোয়া) অবশ্যই কবুল করতেন– সেখানে আমার জন্য কিংবা অন্য কারও বেলায় এর বিপরীতটি কীভাবে সত্য হতে পারে? আমি স্বীকার করছি, ইংরেজদের ক্ষমতা আছে; তারা চাইলে আমাদেরকে ফাঁসি দিতে পারে অথবা বন্দিও করতে পারে। অথচ তখন শত্রুর মোকাবিলায় তাদেরকে দুর্বল মনে হচ্ছিল। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাদের অবস্থা শোচনীয় ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমার দাবি হলো, আমার দোয়ার কল্যাণে তাদের সমস্যাবলি দূরীভূত হতে পারে। কেননা, আমাদের প্রাণের ওপর ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ অন্য নিয়মের অধীনে আর এ সম্পর্কে দোয়ার গ্রহণীয়তা অন্য আরেকটি বিধানের অধীন। ইরানের বাদশাহ্ মহানবী (সা.)-কে বন্দি করার পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু তখনও আটককারীরা আসে নি; শুধুমাত্র বার্তা নিয়ে ইয়েমেনের গভর্নরের দূত এসেছিল। কিন্তু তিনি (সা.) তাকে বলেন, যাও, গিয়ে তোমার মনিবকে বলে দাও– আমরা আসব না। তোমাদের খোদাকে আমাদের খোদা হত্যা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা সেই বাদশাহ্র পুত্রের মাঝে প্রেরণা সঞ্চার করেন ফলে সে তার পিতাকে হত্যা করে। কিন্তু উহুদের যুদ্ধে শত্রুরা তাঁর ওপর আক্রমণ করে, পাথর নিক্ষেপ করে, তাঁর দাঁত ভেঙ্গে যায়, মাথা ক্ষতবিক্ষত হয় এবং শিরস্ত্রাণের আংটা মাথার মধ্যে ঢুকে যায়, তিনি (সা.) অচেতন হয়ে পড়ে যান এবং তাঁর ওপরে আরো কয়েকজন সাহাবী এসে পড়েন আর সাহাবীরা ধরে নেন, তিনি (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। এখন কেউ যদি বলে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সম্মান রক্ষায় এতটা আত্মভিমানী ছিলেন যে, তাঁর খাতিরে এত দূরে ইরানের বাদশাহ্কে হত্যা করিয়েছেন! কিন্তু প্রশ্ন হলো, উহুদের প্রান্তরে কাফিরদেরকে কেন তাঁর ওপর এভাবে পাথর নিক্ষেপ করার সুযোগ দিলেন? স্মরণ রাখা উচিত, এসব আপত্তি যথার্থ নয়। এগুলো আল্লাহ্ তা'লার সার্বজনীন প্রজ্ঞা ও পরিস্থিতির যথার্থতার নিরিখে হয়। এ হলো রহস্য। কোনো কোনো সময়ে তিনি তুচ্ছ বিষয়ে পাকড়াও করেন আবার কখনো কখনো কোনো পরিকল্পনার অধীনে অবকাশ দেন, যেন মানুষের সীমাবদ্ধতা এবং নিরবলম্ব হওয়া প্রকাশ পায়।

ঘটনার বিবরণ অব্যাহত আছে। হত্যার গুজবের পর পুনরায় সাহাবীদের মহানবী (সা.)-এর দর্শন লাভেরও সুযোগ হয়। এর বিশদ বিবরণে লেখা আছে যে, হযরত আবু উবায়দা (রা.) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি তখন সর্বপ্রথম মহানবী (সা.)-কে এমর্মে শনাক্ত করতে পারেন যে, তিনি বেঁচে আছেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে তাঁর চোখ দেখে চিনতে পারি, যা শিরস্ত্রাণের নীচ দিয়ে উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় প্রতিভাত হচ্ছিল। [শিরস্ত্রাণ হচ্ছে সেই আবরণী যা যুদ্ধের সময় সৈন্যরা মাথা ও মুখমণ্ডলের সুরক্ষার জন্য পরিধান করে।] যাহোক, তিনি বলেন, চক্ষুদ্বয়ে আমি আকর্ষণীয় ঔজ্জ্বল্য এবং আলো দেখতে পাচ্ছিলাম (আর) আমি বুঝতে পারি যে, মহানবী (সা.) জীবিত

আছেন। মোটকথা, আমি তাঁকে চেনামাত্রই পুরো শক্তি দিয়ে চিৎকার করি যে, **হে মুসলমানগণ! সুসংবাদ! সুসংবাদ! মহানবী (সা.) জীবিত আছেন**। তখন মহানবী (সা.) আমার প্রতি ইঙ্গিত করে আমাকে নীরব থাকতে বলেন।

অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, আরেকজন সাহাবী ছিলেন যিনি সর্বপ্রথম মহানবী (সা.)-কে শনাক্ত করেছেন। যেমন, একজন লেখক লিখেছে, গর্তে পড়ে যাবার পর মহানবী (সা.)-এর সমস্ত পবিত্র দেহ রক্তে রঞ্জিত ছিল। তিনি (সা.) বের হয়ে আসার পর হযরত কা'ব বিন মালেক (রা.) শিরস্ত্রাণের মধ্য দিয়েই তাঁর (সা.) নয়নযুগল দেখে তাঁকে চিনে ফেলেন এবং আনন্দে চিৎকার শুরু করেন, يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم অর্থাৎ, হে মুসলমানগণ! আনন্দিত হও, ইনি হচ্ছেন মহানবী (সা.)। তখন মহানবী (সা.) তাঁকে ইঙ্গিতে নীরব থাকতে বলেন। কিন্তু মুসলমানরা যতই তাঁর (সা.) জীবিত থাকার বিষয়ে অবগত হতে থাকে ততই তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে ছুটে আসে। তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.), হযরত আলী বিন আবি তালেব (রা.), হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.), হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.), হযরত হারেস বিন সিম্মা (রা.) এবং অন্যান্য মুসলমানও ছিলেন। তিনি (সা.) তাঁর সাহাবীদের সাথে নিয়ে উহুদ পাহাড়ের একটি গিরিপথে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পথিমধ্যে শত্রুরা যতই আক্রমণ করে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ তাদেরকে সমুচিত উত্তর প্রদান করেন। কোনো কোনো পুস্তকে রয়েছে, যুদ্ধের মোড় ঘুরে যাওয়ার কারণে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ও অবর্ণনীয় হয়ে পড়েছিল। অকস্মাৎ মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন মু'আয এবং হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-র মাঝে দৃশ্যমান হন এবং আমরা তাঁর (সা.) হাঁটার ভঙ্গি দেখে তাঁকে চিনে ফেলি। সে সময় আমাদের আনন্দের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। তখন এমন মনে হচ্ছিল যেন আমরা পরাজিতও হই নি আর আমাদের কোনো ক্ষতিও হয় নি। যখন সব মুসলমান মহানবী (সা.)-কে দেখে চিনতে পারে তখন সবাই মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে পতঙ্গের মতো জড়ো হয়ে যায়। তিনি (সা.) তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে একটি গিরিপথের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সে সময় তাঁর (সা.) সাথে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.) এবং হযরত হারেস বিন সিম্মা (রা.) ছিলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, মুসলমানদের জন্য এই আক্রমণ যেহেতু একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল তাই তারা গভীরভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে এবং বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকার কারণে শত্রুদের মোকাবিলা করতে পারে নি। রণক্ষেত্রে কাফিররা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং অধিকাংশ সাহাবী হতচকিত ও উদ্বিগ্ন অবস্থায় মদীনা অভিমুখে ছুটতে থাকে। এমন একটি সময়ও আসে যখন মহানবী (সা.)-এর পাশে কেবলমাত্র বারোজন সাহাবী অবশিষ্ট থাকেন। আর এমনও একটি সময় আসে যখন মহানবী (সা.)-এর পাশে বারোজনও নয়, কেবলমাত্র তিনজন সাহাবী রয়ে যান আর কাফিররা

বিশেষভাবে মহানবী (সা.)-কে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। কিন্তু এরূপ নাজুক অবস্থায়ও তিনি (সা.) শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ়তার সাথে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং নিজের স্থান থেকে সরেন নি। অবশেষে শত্রুরা হঠাৎ করে প্রচণ্ড আক্রমণ রচনা করে এবং সেই কয়েকজন সাহাবীকেও পিছু হটিয়ে দেওয়া হয় এবং মহানবী (সা.) আহত হয়ে একটি গর্তে পড়ে যান। তাঁর (সা.) ওপর কয়েকজন সাহাবীও (যারা তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন,) শহীদ হয়ে পড়ে যান এবং এভাবে কিছু সময়ের জন্য মহানবী (সা.) সাহাবীদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যান। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। এই সংবাদ সাহাবীদের জন্য মহা উদ্বেগের কারণ হয় এবং তাদের অবশিষ্ট মনোবলও হারিয়ে যেতে থাকে। যেসব সাহাবী (রা.) সে সময় তাঁর (সা.) পাশে উপস্থিত ছিলেন এবং জীবিত ছিলেন, তারা লাশ সরিয়ে মহানবী (সা.)-কে গর্ত থেকে তুলে আনেন এবং নিরাপত্তার জন্য তাঁর (সা.) চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হন।

মহানবী (সা.) যখন মুশরিক সেনা বেষ্টনি থেকে বের হয়ে নিজ আত্মত্যাগী সাথিদের নিয়ে পাহাড়ের গিরিপথের দিকে যাচ্ছিলেন তখন উসমান ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগীরা একটি সাদা-কালো ঘোড়ায় চড়ে মহানবী (সা.)-এর দিকে অগ্রসর হয়। সে আপাদমস্তক বর্ম পরিহিত ছিল এবং সেই গিরিপথের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল যেদিকে মহানবী (সা.) যাচ্ছিলেন। সে বলছিল, হয় সে জীবিত থাকবে নতুবা আমি! মহানবী (সা.) তার কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়েন। তখন উসমানের ঘোড়া সেখানে খুঁড়ে রাখা গর্তগুলোর মধ্য থেকে একটি গর্তে হোঁচট খায় এবং সে সেই গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। তখন হযরত হারেস (রা.) তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ তারা উভয়ে একে অন্যের ওপর তরবারির আঘাত হানে। হঠাৎই হযরত হারেস বিন সিম্মা (রা.) তার পায়ে তরবারি দিয়ে আঘাত করেন। উসমান সেই আঘাতে একেবারে বসে পড়ে। তখন হযরত হারেস (রা.) তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেন আর তার বর্ম এবং শিরস্ত্রাণ খুলে নেন। মহানবী (সা.) এটি দেখে বলেন, সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি তাকে ধ্বংস করেছেন। তখনই উবায়দুল্লাহ্ বিন জাবের আমরী হযরত হারেস (রা.)-র ওপর আক্রমণ করে এবং তাঁর কপালে আঘাত করে তাঁকে আহত করে। হযরত হারেস (রা.)-র সাথি তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যান। তৎক্ষণাৎ হযরত আবু দুজানা আনসারী (রা.) দ্রুত উবায়দুল্লাহ্‌র ওপর চড়াও হন এবং তাকে হত্যা করে মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে আসেন।

মক্কার এক নেতা উবাই বিন খালাফও মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করেছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। মহানবী (সা.) যখন গিরিপথের দিকে যাচ্ছিলেন তখন উবাই বিন খালাফ সেদিকে চলে আসে। উবাই বিন খালাফ বদরের যুদ্ধে ফিদিয়ার বিনিময়ে মুক্ত হয়েছিল। সে বলে, আমার কাছে অউদ ঘোড়া আছে যেটিকে আমি প্রতিদিন এক 'ফারক' তথা সাড়ে সাত কিলো ভুট্টা খাওয়াই। এটি খুব শক্তিশালী এবং খুবই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। আমি এটিতে চড়ে মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করব। মহানবী (সা.)-এর কানে তার এই কথা পৌঁছামাত্র তিনি (সা.) বলেন, না, বরং আমি তাকে হত্যা

করব। এক ভাষ্যানুসারে সে হিজরতের পূর্বে পবিত্র মক্কা নগরীতে মহানবী (সা.)-কে একথা বলেছিল। মোটকথা উহুদের যুদ্ধের সময় হুযূর (সা.) নিজ সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমার আশংকা হলো, উবাই বিন খালাফ আমার পেছন দিক থেকে আমার ওপর আক্রমণ করবে। তোমরা তাকে দেখতেই আমাকে জানাবে। সে বর্ম পরিহিত অবস্থায় ঘোড়া নাচিয়ে আসছিল। মহানবী (সা.)-ও তাকে দেখে ফেলেন। সে বলছিল, মুহাম্মদ (সা.) কোথায়? যদি সে বেঁচে যায় তাহলে আমার রক্ষা নেই। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) তার মুখোমুখি এসে দাঁড়ান। তিনি (রা.) তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছিলেন। [অর্থাৎ মুসআব বিন উমায়ের (রা.) মহানবী (সা.)-কে সুরক্ষা করছিলেন]। সে মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-কে শহীদ করে দেয়। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! উবাই আপনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আপনি চাইলে আমাদের মধ্য থেকে কেউ একজন তার ভবলীলা সাঙ্গ করতে পারে। অপর রেওয়ায়েত অনুসারে, সাবায়ে কেরাম (রা.) তার সামনে এসে দাঁড়ান। তিনি (সা.) বলেন, তাকে ছেড়ে দাও, তার পথ থেকে সরে যাও। সে যখন তাঁর (সা.) নিকটবর্তী হয় তখন তিনি (সা.) বললেন, হে মিথ্যাবাদী! কোথায় পালাচ্ছিস? মহানবী (সা.) হযরত হারেসা বিন সিম্মা (রা.)-র কাছ থেকে বর্শা নেন। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-র কাছ থেকে বর্শা নেন। মহানবী (সা.) গা-ঝাড়া দিলেন আর সাহাবায়ে কেরাম তাঁর (সা.) কাছ থেকে এমনভাবে ছিটকে গেলেন যেভাবে উটের কোমর থেকে মাছি ছিটকে পড়ে। তিনি (সা.) উবাই-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং তার ঘাড় বরাবর বর্শা নিক্ষেপ করলেন অথবা শিরস্ত্রাণ এবং বর্মের মাঝ বরাবর দৃশ্যমান স্থানে বর্শা নিক্ষেপ করলেন, যার ফলে সে তার ঘোড়া থেকে কয়েকবার ডিগবাজি খেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ে। সে ষাঁড়ের ন্যায় গর্জন করতে থাকে। তার ঘাড়ে সামান্য আঁচড় লাগে, তার রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে যায় অথবা তার পাঁজরের কোনো একটি হাড় ভেঙে যায়। সে তার নিজের লোকদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে আর বলে, খোদার কসম! আমাকে মুহাম্মদ (সা.) মেরে ফেলেছে। তার জাতির লোকেরা তাকে বলল, তোমার মনোবল হারিয়ে গেছে। খোদার কসম, তোমার তেমন কিছুই হয় নি! এটি একটি সামান্য আঁচড় মাত্র; এমন আঘাত যদি আমাদের কারো চোখেও লাগতো তবুও তার কিছুই হতো না। সে বললো, আমি লাত এবং উয্যার কসম খেয়ে বলছি, যে আঘাত আমি পেয়েছি তা যদি আহলে যুল-মাজায অথবা রাবিয়া ও মুযার গোত্রের ওপর লাগত তাহলে তারা সবাই মারা যেত। সে অর্থাৎ মুহাম্মদ আমাকে মক্কা মুকাররমায় বলেছিল, 'আমি তোমাকে হত্যা করব'। খোদার কসম! মুহাম্মদ যদি আমার ওপর থুথুও ফেলত আমি মরে যেতাম। মুশরিকরা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন সে সারেফ নামক স্থানে মৃত্যু বরণ করে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। সারেফ একটি বড়ো উপত্যকা যেটিকে বর্তমানে নওয়ারিয়াহ বলা হয়। বিদায় হজ্জের সময় মদীনা থেকে যাত্রাপথে এটি মহানবী (সা.)-এর সপ্তম মঞ্জিল ছিল যা তানঈমের নিকটবর্তী অর্থাৎ মক্কা থেকে নয় বা দশ মাইলের দূরত্বে অবস্থিত।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, 'কুরাইশরা যখন কিছুটা পিছু হটে এবং যুদ্ধের প্রান্তরে যে মুসলমানরা উপস্থিত ছিল তারা মহানবী (সা.)-কে চিনতে পেরে তাঁর (সা.) চারপাশে একত্রিত হয়, তখন তিনি (সা.) ঐ সাহাবীদের সাথে ধীরে ধীরে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে একটি সুরক্ষিত গিরিখাদে আশ্রয় নেন। পথিমধ্যে মক্কার এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উবাই বিন খালাফ-এর দৃষ্টি রসূলে করীম (সা.)-এর ওপর পড়ে, তখন সে বিদ্বেষ ও শত্রুতায় অন্ধ হয়ে এই বাক্য উচ্চারণ করতে করতে করতে দৌড়ে আসছিল যে 'লা নাজাওতু ইন নাজা' অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) যদি বেঁচে যায় তাহলে তো আমি বাঁচবো না! সাহাবীগণ তাকে আটকাতে চাইলেন কিন্তু মহানবী (সা.) তাদেরকে বললেন, 'তাকে ছেড়ে দাও আর আমার কাছে আসতে দাও'। যখন সে তাঁর (সা.)-এর ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে তাঁর (সা.) নিকটে আসল তখন হুযূর (সা.) একটি বর্শা নিয়ে তার ওপর আঘাত করলেন আর সেই আঘাতে সে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ে গেল। এরপর মাটি থেকে উঠে চিৎকার করতে করতে পালাতে লাগল এবং বাহ্যত খুব বড়ো আঘাত না হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই সে মারা যায়।

মহানবী (সা.) তাঁর সাথিদের নিয়ে গিরিপথে পৌঁছলেন। এ সম্পর্কে ইবনে ইসহাকের ভাষ্য হলো, মহানবী (সা.)-এর শাহাদাতের ঘোষণা এবং কিছু লোকের ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর সর্বপ্রথম মহানবী (সা.)-এর ওপর হযরত কা'ব বিন মালিক (রা.)-র দৃষ্টি পড়ে। তিনি বর্ণনা করেন যে, শিরস্ত্রাণের ভিতর থেকে মহানবী (সা.)-এর উজ্জ্বল নয়নযুগল দেখতে পেয়ে আমি উচ্চস্বরে বলতে লাগলাম 'হে মুসলমানরা, তোমরা আনন্দিত হও! এই যে এখানে মহানবী (সা.)। আমার কথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে হাতের ইশারায় চুপ থাকার নির্দেশ দিলেন। যখন মুসলমানরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে চিনতে পারল তখন তারা মহানবী (সা.)-কে সাথে নিয়ে একটি গিরিপথের দিকে রওয়ানা হলো। তাঁর (সা.) সাথে হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ এবং হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম ও হযরত হারেস বিন সিম্মা (রা.) উপস্থিত ছিলেন। মহানবী (সা.) যখন সাহাবীদের সাথে সেই গিরিপথে অবস্থান করছিলেন তখন হঠাৎ করে কুরাইশের একটি দল সেই পাহাড়ের ওপরে পৌঁছে যায় আর কুরাইশদের সেই দলে খালিদ বিন ওয়ালীদও ছিলেন। রসূলে করীম (সা.) শত্রুদের ওপরে দেখতে পেয়ে এই দোয়া করলেন:

اللهم انه لا ينبغى لهم ان يعلونا اللهم لا قوة لنا الا بك۔

হে আল্লাহ্! আমাদের ওপর তাদের বিজয় লাভ করা সঙ্গত নয়। হে আল্লাহ্, তুমি ব্যতীত আমাদের কোনো শক্তি-সামর্থ্য নাই।' ঠিক সেই মুহূর্তেই হযরত উমর (রা.) মুহাজিরদের একটি দল নিয়ে সেই কাফির দলের মোকাবিলা করেন এবং তাদেরকে পিছু হটতে ও পাহাড় থেকে নীচে নামতে বাধ্য করেন।

সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে:

মহানবী (সা.) যখন গিরিপথে পৌঁছালেন, তখন কুরাইশের একটি দল খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে পাহাড়ে উঠে আক্রমণোদ্যত হয়। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে হযরত উমর (রা.) কতিপয় মুহাজিরকে সঙ্গে নিয়ে তার মোকাবেলা করেন এবং তাকে পিছু হটিয়ে দেন।

এই যুদ্ধের ঘটনার একটি রেওয়ায়েত ইতিহাসে এভাবে পাওয়া যায়, হযরত যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) উহুদের দিন দুটি বর্ম পরিধান করেছিলেন। তিনি (সা.) পাহাড়ের ওপর আরোহণের চেষ্টা করেন, কিন্তু বর্মের ওজনের কারণে এবং মাথা ও চেহারার ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণের কারণে তিনি (সা.) দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, ফলে সেই পাহাড়ে উঠতে পারেন নি। হযরত তালহা নীচে বসে পড়েন আর মহানবী (সা.) তাঁর পিঠের ওপর পা রেখে পাহাড়ে আরোহণ করেন। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি সেই সময় মহানবী (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তালহা নিজের জন্য জান্নাত আবশ্যক করে নিয়েছে।

আরেক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) পাহাড়ের গিরিপথে থাকা অবস্থায় পাহাড়ের ওপরে ওঠার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। কিন্তু তিনি (সা.) যখন পাহাড়ে উঠতে যান তখন মাথার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরার কারণে এবং দুর্বলতার কারণে ওঠার শক্তি পান নি। এছাড়া তাঁর শরীরে দুটি বর্মের বোঝা ছিল। এটি দেখে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ দ্রুত তাঁর সামনে বসে পড়েন এবং তাঁকে কাঁধে বসিয়ে পাহাড়ে তুলে দেন। তখনই তিনি (সা.) বলেন, তালহার এই পুণ্যকর্মের ফলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে। যেভাবে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, এই যুদ্ধেই মহানবী (সা.)-এর পবিত্র দাঁত শহীদ হয়েছিল। তখনকার যে চিত্র হযরত আবু বকর অংকন করেছেন সে অনুযায়ী হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন,

হযরত আবু বকর (রা.) যখন উহুদের দিনের স্মৃতিচারণ করতেন তখন বলতেন, সেই দিন পুরোটাই ছিল হযরত তালহার (রা.)। তারপর তিনি বিস্তারিত বিবরণে বলতেন, আমিও তাদের মাঝে একজন ছিলাম যারা উহুদের দিন মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে এসেছিল। আমি দেখি, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে তাঁর নিরাপত্তা বিধানের জন্য যুদ্ধ করছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা হলো, [অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) বলেন যে, তিনি তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করছিলেন।] হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, তিনি যেন তালহা হন। যে সুযোগ আমার হাতছাড়া হয়েছে তা তো হয়েছেই; আমি মনে মনে বলি, আমার জাতির কোনো এক ব্যক্তি এই কাজ করার সুযোগ পেলে তা আমার জন্য অধিক আনন্দের কারণ হবে। তিনি বলেন, আমার এবং মহানবী (সা.)-এর মাঝে এক ব্যক্তি ছিল যাকে আমি চিনতে পারি নি। অথচ আমি সেই ব্যক্তির তুলনায় রসূল (সা.)-এর অধিক নিকটে ছিলাম। কিন্তু তিনি এত দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন যতটা দ্রুত অগ্রসর হওয়া আমার জন্য সম্ভবপর ছিল না। পরবর্তীতে দেখলাম, তিনি ছিলেন আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ (রা.)।

এরপর আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছাই। [সেখানে তখন দুইজন ব্যক্তি ছিলেন, অর্থাৎ হযরত তালহাও ছিলেন এবং আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ (রা.)-ও ছিলেন।] তাঁর (সা.) সামনের দুটি দাঁত ও ছেদন দাঁতের মাঝের দাঁত ভেঙে গিয়েছিল এবং চেহারা ক্ষতবিক্ষত ছিল। তাঁর পবিত্র গালে শিরস্ত্রাণের আংটা ঢুকে গিয়েছিল। রসূলে করীম (সা.) বলেন, তোমরা দুজনে নিজ সাথিকে সাহায্য করো। অর্থাৎ তিনি (সা.) তালহার দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। তার অনেক বেশি রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। হযরত তালহা মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তা বিধান করতে গিয়ে অনেক বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহানবী (সা.) এ কথা বলেন নি যে, আমার শুশ্রূষা করো; বরং তিনি বলেন, যাও, তালহার শুশ্রূষা করো। আমি তাকে (রা.) সেখানে রেখে সম্মুখে অগ্রসর হই, অর্থাৎ আমরা তালহার দিকে মনোযোগ দেই নি বরং মহানবী (সা.)-এর প্রতি মনোযোগী হই যেন শিরস্ত্রাণের আংটা মহানবী (সা.)-এর গাল থেকে বের করে ফেলতে পারি। তখন হযরত আবু উবায়দা বলেন, আমার অধিকারের শপথ! এ কাজটি আপনি আমার জন্য ছেড়ে দিন। অতএব আমি আবু উবায়দার আংটা বের করার অনুরোধের প্রেক্ষিতে এ দায়িত্ব তার হাতে অর্পণ করে পেছনে সরে যাই। হযরত আবু উবায়দা (রা.) এটি পছন্দ করেন নি যে, তিনি সেই আংটাগুলো হাত দিয়ে টেনে বের করবেন। কেননা এতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কষ্ট হওয়ার আশংকা ছিল। তিনি এই আংটাগুলো নিজের দাঁত দিয়ে বের করার চেষ্টা করলেন এবং একটি আংটা বের করলেন। আংটা বের হবার সাথে সাথে তাঁর নিজের সামনের একটি দাঁতও ভেঙে গেল। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি বললাম, আমিও একইভাবে দ্বিতীয় আংটাটি বের করার চেষ্টা করি। তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) আবার বললেন, আমি আপনাকে আমার অধিকারের কসম দিচ্ছি! আপনি এ কাজ আমার জন্য ছেড়ে দিন। অর্থাৎ দ্বিতীয় আংটাটিও আমিই বের করব, আপনি না। এতে তিনি পিছনে সরে আসলেন। এবারও তিনি পূর্বের মতোই করলেন। হযরত আবু উবায়দার (রা.) সামনের আরেকটি দাঁতও আংটা বের হবার সাথে সাথে ভেঙে গেল। হযরত আবু বকর (রা.) বলতেন, হযরত আবু উবায়দা (রা.) সামনের দিকের ভাঙা দাঁতবিশিষ্ট লোকদের মাঝে সবচেয়ে সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চিকিৎসা সম্পন্ন করার পর আমরা তালহা (রা.)-র কাছে গেলাম। তিনি একটি গর্তে পড়ে ছিলেন। তার শরীরে বর্শা, তরবারি ও তিরের প্রায় সত্তরটি আঘাত ছিল এবং তার আঙ্গুলও কর্তিত ছিল। আমরা তার ক্ষতস্থানগুলো বেঁধে দেই।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) ছাড়াও হযরত উকবা বিন ওয়াহাব (রা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কেও রেওয়ায়েত পাওয়া যায় যে, তারা আংটাগুলো বের করেছিলেন। কিন্তু প্রথম রেওয়ায়েতটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র গাল থেকে যখন দুটি আংটা বের করা হলো তখন এমনভাবে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল যেভাবে ভরা পানির ব্যাগ থেকে পানি

প্রবাহিত হয়। মালেক বিন সিনান (রা.) নিজের মুখে রক্ত চুষতে থাকেন। তিনি (সা.) তাকে বলেন, তুমি কি রক্ত পান করছ? তিনি উত্তরে বলেন, জি হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, যার রক্তকে আমার রক্ত স্পর্শ করেছে তাকে আগুন স্পর্শ করবে না। এটি 'সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ'-এর রেওয়ায়েত। কিন্তু এই রেওয়ায়েত বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার দাবি রাখে। আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন, এটি কতটুকু সঠিক। কেননা যদি এভাবে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করে তাহলে রক্ত বন্ধ হবার পরিবর্তে আরো বেশি রক্তক্ষরণের এবং দুর্বলতা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। পরবর্তী রেওয়ায়েতগুলোতে এর উত্তরও এসে যায়। এজন্য এই রেওয়ায়েতটি অতটা নির্ভরযোগ্য নয়।

উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) যে আঘাত পেয়েছিলেন সে বিষয়ে বুখারীর রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত সাহল বিন সা'দ (রা.)-কে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আঘাতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমার কাছে যদি জানতে চাও তাহলে আল্লাহ্‌র কসম! আমি ভালোভাবে জানি কে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ক্ষতস্থান ধৌত করছিল। অর্থাৎ এই দৃশ্য যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে– কে পানি ঢালছিল আর কী ঔষধ লাগানো হয়েছিল। হযরত সাহল (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মেয়ে হযরত ফাতেমা (রা.) ক্ষতস্থান ধুচ্ছিলেন এবং হযরত আলী (রা.) ঢালের মাধ্যমে পানি ঢালছিলেন। যখন হযরত ফাতেমা (রা.) লক্ষ্য করলেন, পানির কারণে আরো বেশি রক্ত বের হচ্ছে, তখন তিনি এক টুকরো চট পুড়িয়ে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। এতে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। সেদিন তাঁর (সা.) সামনের দাঁতও ভেঙে গিয়েছিল আর তাঁর চেহারা ক্ষতবিক্ষত ছিল। তাঁর শিরস্ত্রাণ তাঁর মাথায় ভেঙে গিয়েছিল।

এখানে রক্ত বন্ধ করার এবং ধুয়ে ফেলার উল্লেখ রয়েছে, রক্ত চোষার কোনো উল্লেখ নেই। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত আর এটিই সঠিক।

মহানবী (সা.) যখন গিরিপথের মুখে পৌঁছালেন তখন আলী বিন আবি তালেব (রা.) মিরাসের পানি নিজের ঢালে ভরে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসেন। 'মিরাস' কী জিনিস? উহুদ পাহাড়ের যেখানে ছোটো-বড়ো গর্তে বৃষ্টির পানি জমা হতো সেই গর্তের নামই মিরাস। মিরাসের অর্থ এটিই লিখিত আছে। এই জায়গা সেই স্থানের নিকট যেখানে হযরত হামযা (রা.) শহীদ হয়েছিলেন। দুর্গন্ধের কারণে তিনি (সা.) তা পান করেন নি; তিনি নিজের চেহারার রক্ত ধুয়ে নেন আর মাথায় পানি দেন আর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সেই ব্যক্তির প্রতি খুব বেশি ক্রোধান্বিত হন যারা তাঁর নবীর চেহারাকে ক্ষতবিক্ষত করে।

মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) মহিলাদের কাছ থেকে পানি চাইতে গেলেন। তাদের কাছে পানি ছিল না। রসূলুল্লাহ্ (সা.) খুবই পিপাসার্ত ছিলেন। তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) একটি ঝরনার কাছে গিয়ে সেখান থেকে সুপেয় পানি নিয়ে আসেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) সেই পানি পান করে তার মঙ্গলের জন্য দোয়া করেন।

তিবরানীতে সাহল বিন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারা উহুদের দিন ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল এবং তাঁর (সা.) পবিত্র দাঁত শহীদ হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিরস্ত্রাণ তাঁর পবিত্র মাথায় ভেঙে গিয়েছিল। মুশরিকরা প্রস্থান করলে মহিলারা সাহাবীদের কাছে গেলেন; তাদের মধ্যে ফাতেমা (রা.)-ও ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দেখে তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন আর তাঁর ক্ষতস্থান ধৌত করতে লাগলেন। আর আলী (রা.) ঢালের মাধ্যমে পানি ঢালতে লাগলেন। কিন্তু রক্ত বেশি পরিমাণে প্রবাহিত হচ্ছিল, তাই হযরত ফাতেমা (রা.) চাটাইয়ের কিছু অংশ পুড়িয়ে ছাই বানালেন আর তা দিয়ে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলেন। এক পর্যায়ে তা ক্ষতস্থানের সাথে মিশে গেল আর রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর (সা.) পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে রক্ত ঝরছিল। তিনি (সা.) স্বয়ং সেই রক্ত পরিষ্কার করছিলেন আর বলছিলেন, كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ সেই জাতি কীভাবে সফল হতে পারে যারা তাদের নবীকে আহত করেছে আর তাঁর কর্তন-দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে; অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার দিকে ডাকছেন? ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে বর্ণনা অব্যাহত থাকবে।

ফিলিস্তিনের জন্য আমি (বরাবর) দোয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছি। এখন মুসলমানদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফিলিস্তিনকে রক্ষা করার কথা চিন্তা করার পরিবর্তে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছে। শুনলাম, পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়ে গেছে; তারা পরস্পরের ওপর বোমা বর্ষণ করেছে। এখন এমন ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লাই সকল মুসলমান দেশ ও তাদের নেতৃবৃন্দকে বিবেকবুদ্ধি দান করুন। তাদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝার সামর্থ্য দান করেন, তারা যেন এক ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত হয়।

নামাযের পর আমি দু'জন প্রয়াত ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথমটি সৈয়্যদ দাউদ মুজাফ্ফর শাহ্ সাহেবের পুত্র সৈয়্যদ মওলুদ আহমদ সাহেবের, যিনি কিছুদিন আগে ৭৬ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ও সৈয়্যদা উম্মে তাহের সাহেবার দৌহিত্র ছিলেন আর সাহেবযাদি আমাতুল হাকীম সাহেবা ও সৈয়দ দাউদ মুজাফ্ফর শাহ্ সাহেবের পুত্র ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসিয়্যতকারী ছিলেন। আমার খালাতো ভাইও ছিলেন আর আমার স্ত্রীর বড়ো ভাই ছিলেন। তার দাদা সৈয়্যদ মাহমুদউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব, সৈয়্যদ আব্দুস সাত্তার শাহ সাহেবের (রা.) পুত্র ছিলেন। হযরত ডা. সৈয়্যদ আব্দুস সাত্তার শাহ্ সাহেবের (রা.) তাকওয়া ও পবিত্রতা ছিল পরম মার্গের। তিনি পরম বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনকারী ছিলেন আর হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল ইবাদ আদায়ে অগ্রগামী ছিলেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) তার ব্যাপারে একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা

করেন। তিনি (রা.) বলেন, ডাক্তার সৈয়দ আব্দুস সাত্তার শাহ্ সাহেব স্বয়ং আমাকে বলেছেন, একদা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) অনেক অসুস্থ হয়ে পড়েন আর এটি সেই যুগের কথা যখন তিনি হুযূর (আ.)-এর বাড়িতে থাকতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ছাগল সদকা করেন। ডাক্তার সাহেব বলেন, আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি রাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র কাছে ছিলাম এবং তাঁকে ঔষধ খাওয়াচ্ছিলাম। সকালে যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আসলেন তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল নিবেদন করেন, হুযূর! ডাক্তার সাহেব সারা রাত আমার পাশে জেগে ছিলেন এবং ঔষধ ইত্যাদি খাইয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একথা শুনে খুব আনন্দিত হন এবং বলেন, তাকে দেখে আমাদেরও ঈর্ষা হয়। এটি জান্নাতি পরিবার। হযরত ডা. আব্দুস সাত্তার সাহেব সম্পর্কে একথাটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারবার বলেন।

সৈয়দ মওলুদ শাহ্ সাহেব রাবওয়ায় পড়াশোনা করেন অর্থাৎ মেট্রিক করেন, আইএসসি সম্পন্ন করেন। এরপর লাহোরে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন। পাকিস্তানেও বিভিন্ন কোম্পানিতে কাজ করেন। এরপর কয়েক বছর নাইজেরিয়াতেও একটি কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতে যান এবং সেখানে কাজ করেন আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় খুব সফল জীবনযাপন করেছেন।

তার বিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) পড়িয়েছিলেন। তখন তিনি (রাহে.) যে খুতবা প্রদান করেন তাতে তিনি বলেছিলেন, বৈবাহিক সম্পর্ক গাছের কলমের ন্যায় হয়ে থাকে যেগুলোকে শুরুতেই ভালোভাবে পরিচর্যা করতে হয়। কিছু পুরোনো বিয়ের খুতবাও আমি পড়ে শুনাই কারণ অনেক মানুষ প্রশ্ন করে যে, আমরা কীভাবে সুন্দর পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারি। এসব হলো পথনির্দেশনা, এগুলো দৃষ্টিতে রাখুন যা সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। অনেক সময় আমি নিজে খুতবায় দিকনির্দেশনা বিবাহের এলানের সময় বলে দেই, অনেক সময় বিগত খলীফাদের পথনির্দেশনাও তুলে ধরে থাকি। তিনি (রাহে.) বলেন, যেটিকে শুরুতেই খুব যত্ন করতে হয়। পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা মোতাবেক এই কলমকে কওলে সাদীদ-এর সুতা দিয়ে বাঁধতে হয়, অর্থাৎ পূর্ণ সত্যতার সুতো দিয়ে বাঁধতে হয়; তখন গিয়ে এর সুরক্ষা বিধান হয়। এই দায়িত্ব কেবল স্বামী-স্ত্রীর নয়, বরং তাদের পরিবার-পরিজনের ওপর, তাদের আশপাশের লোকদের ওপর বরং তাদের বন্ধুবান্ধবের ওপরও বর্তায়। কেননা অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয় কুধারণা, চোগলখুরি, অধৈর্য অথবা রাগের ফলে। আর সেটিকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য কওলে সাদীদ তথা সত্য কথা খুব সুদৃঢ় সুতার ভূমিকা পালন করে। এরপর তিনি বলেন, আল্লাহ্ করুন, আমি এখন যে বিবাহের এলান করছি সেটি উভয় পরিবার, জামা'ত এবং মানবতার জন্য বরকতময় হোক, তাদের মাধ্যমে ধর্মসেবক বংশধর সৃষ্টি হোক। এরপর তিনি বলেন, এই সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে আমার ছোটো বোন আমাতুল হাকীম এবং সৈয়দ দাউদ মুজাফ্ফর শাহ সাহেবের পুত্র সৈয়দ মওলুদ আহমদের এবং ডাক্তার সৈয়দ গোলাম মুজতবার মেয়ে

লুবনা শাহবাযের মাঝে। এরপর ডাক্তার সাহেবের বিষয়েও তিনি বলেন যে, ডাক্তার সাহেব ঐসকল প্রাথমিক ডাক্তারদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা পশ্চিম আফ্রিকায় ওয়াকফ করে ডাক্তার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আর তার হাতে আল্লাহ্ তা'লা অনেক আরোগ্য রেখেছিলেন। সফল অস্ত্রোপচারকারী হিসেবে তিনি প্রথমে ঘানায় কাজ করতে থাকেন। এর কিছুকাল পর তাকে নাইজেরিয়া পাঠানো হয়। সেখানেও তিনি তার ওয়াকফে আরযীর মেয়াদ পূর্ণ করেছেন। এরপর হৃদরোগের কারণে তাকে ফেরত আসতে হয়। পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তার জন্য দোয়াও করেন যেন আল্লাহ্ তা'লা তাকে সুস্থ রাখেন এবং তাকে যেন পুনরায় আফ্রিকায় যাওয়ার সৌভাগ্য দেন। আর এই দোয়াও আল্লাহ্ তা'লা কবুল করেন। তিনি আবারও যান এবং দীর্ঘকাল সেখানে অর্থাৎ আফ্রিকায় সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এ দোয়াও করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা সৈয়দ মওলুদ আহমদকেও ধর্মের সেবা করার সৌভাগ্য দান করুন; এবং তিনি এরপর যতটুকুই স্বেচ্ছামূলক কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন–করেছেন।

তার পুত্র সৈয়দ সউদ আহমদ বলেন, আমার পিতা প্রথম থেকেই নামায আদায়ে যত্নবান, ফজরের নামাযের পর কুরআন তিলাওয়াতকারী ছিলেন; [বরং আমি জানি, তাহাজ্জুদ আদায়কারীও ছিলেন]। তিনি অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াতও করতেন। অতঃপর তিনি বলেন, রাতে ঘুমানোর পূর্বে আমাদেরকে পুরোনো বুযূর্গদের কাহিনি এবং ঘটনাসমূহ শোনাতেন। নিয়মিত চাঁদা আদায় করতেন এবং আমাদেরকেও নিয়মিত চাঁদা আদায় করার উপদেশ প্রদান করতেন। হাতখরচ দেবার পর বলতেন, প্রথমে চাঁদা আদায় করে আসো। ঈদী পেলেও বলতেন, চাঁদা আদায় করো। প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ফাইল বানানো ছিল। একইভাবে যখন ওসিয়্যত করিয়েছেন বাচ্চাদের জন্যও পৃথক ফাইল বানিয়েছেন, নিজের রেকর্ডও রেখেছেন এবং সব চাঁদা নিজে আদায় করতেন। রমযান মাসের রোযা ছাড়া শাওয়ালের রোযাও রাখতেন। রমযানে দুবার কুরআন করীম খতম দিতেন এবং তিনবার খতম দেয়ার চেষ্টা করতেন। তিনি আরো লেখেন, অত্যন্ত খাঁটি মানুষ ছিলেন, বড়োই নির্ভেজাল, স্বচ্ছ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, সোজাসাপ্টা কথা বলতেন। অত্যন্ত মিশুক ছিলেন। কারো সাথে পুরোনো সম্পর্ক থাকুক বা নতুন সম্পর্ক হোক– তিনি নিজে যোগাযোগ রাখতেন এবং কোনো না কোনো উপায়ে খবরাখবর নিতেন। ছোটো কিংবা বড়ো সবার সাথে সদ্ব্যবহার করতেন। কারো সম্পর্কে হৃদয়ে বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। হিংসা ছিল না। অন্য কেউ চরম বাড়াবাড়ি করলেও তিনি সর্বদা সদাচরণ করতেন। কেউ অনেক বেশি বাড়াবাড়ি করলেও তিনি নিজে গিয়ে তার সাথে সুসম্পর্ক গড়তেন। একথা কেবল তার ছেলে-ই লিখে নি বরং আমিও দেখেছি, সত্যিকারার্থে এসব গুণাবলি তার মাঝে ছিল। আমার পর্যবেক্ষণও এটাই আর তার পরিচিত অনেক সমবেদনা প্রকাশকারী ব্যক্তি একথা লিখেছেন যে, সত্যিই এসব গুণাবলি তার মাঝে ছিল। অতঃপর এই ছেলেই লিখেছে, একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সফরে গেলে তার জন্য উপহারস্বরূপ একটি খেলনা নিয়ে আসেন যেটিকে তিনি

খুলে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাকে বলেন, আমি তোমাকে উপহার দিলাম আর তুমি তা টুকরো টুকরো করে ফেলেছ! তখন তিনি বলেন, আমি এখনই ঠিক করে দিচ্ছি; আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র সামনে জোড়া লাগিয়েও দেন। অতঃপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার মাকে বলেন, একে ইঞ্জিনিয়ার বানাবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র একথাও পূর্ণ হয়, পরে তিনি ইঞ্জিনিয়ার হন এবং অনেক ভালো ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

অতঃপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র একটি উপদেশ যা সবার জন্য অনেক উপকারী– তা বলে দিচ্ছি। একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সিন্ধুতে নিজের জমি বা ফার্মে গিয়েছেন; তিনিও সেসময় সেখানে ছিলেন। তিনিও তার পিতার সাথে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-র সাথেই গিয়েছে যিনি জমির খবরাখবর নেয়ার জন্য। সেসময় আমের মৌসুম ছিল। ঠিকাদাররা ফল পেড়ে নীচে রেখেছিল। বাগানের ঠিকা দেওয়া হয়, বিক্রি করে দেওয়া হয় এবং ফলের মালিক হয়ে থাকে ঠিকাদার নিজে। কিছু অংশ জমির মালিক নিয়ে থাকে। যাহোক, সে নিজেদের ফল পেড়ে রেখেছিল। ইনি শিশু ছিলেন, সেখান থেকে একটি আম তুলে নেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ফেরত দিয়ে আসো। এটি এখন তোমার মালিকানায় নয় বরং এটি ঠিকাদারদের মালিকানা। এটা ছিল হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র শিক্ষা দেবার পদ্ধতি। তিনি এটি বলতে পারতেন, আমরা যে অংশ পাই তা থেকে তাকে ফেরত দেয়া হবে; কোনো সমস্যা নেই, তুমি খেতে পার। কিন্তু না, তিনি তার দৌহিত্রের এভাবে তরবিয়্যত করেছেন। অতঃপর সৈয়দ মওলুদ সাহেবের কন্যা স্নেহের মারিয়া বলে, পবিত্র কুরআন এবং রূহানী খাযায়েন ও মলফুযাত সবসময় পাঠ করতেন। একইভাবে আমি এটিও জানি যে, তফসীরে কবীরও পাঠ করতেন এবং গভীর জ্ঞান রাখতেন। নিজের জ্ঞান মানুষের সামনে প্রকাশ করতেন না, কিন্তু কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে কথা হলে কোনো প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করলে খুব সুন্দর উত্তর দিতেন। এটি আমাকে অনেকেই জানিয়েছেন। ধর্মীয় এবং জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যখনই কোনো সমস্যা তুলে ধরতাম, তিনি সঠিক সমাধান দিতেন। দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করার উপদেশ দিতেন এবং এটি বলতেন যে, তোমরা দোয়া করো আর বিষয়টি আল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দাও। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার স্ত্রী-সন্তানদের সুরক্ষা করুন ও তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দিন।

তার এক ভাই সৈয়দ সাহেব লিখেছেন, তার অসাধারণ একটি গুণ ছিল– সুখের বা দুঃখের সময় তিনি সর্বাগ্রে আনন্দ বা সমবেদনা প্রকাশ করতেন, অভিনন্দন জানাতেন; কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে তিনি সবার আগে যেতেন।

হানিফ মাহমুদ সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ; তিনি লিখেছেন, ইসলামাবাদে থাকাকালে তার সাথে পরিচয় হয়েছিল। সহজ-সরল, নীরব প্রকৃতির দরবেশ ও ফেরেশতাতুল্য মানুষ ছিলেন। ওয়াকেফে যিন্দেগীদের, বিশেষ করে মুরব্বীদের প্রতি বিশেষ সম্মান রাখতেন। ইসলামাবাদে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল রাবওয়াতেও সেটিকে বজায় রেখেছেন। প্রায়ই মসজিদে নিজেই খুঁজে সাক্ষাৎ করতেন। তিনি আরো বলেন, যখনই তাকে দোয়ার জন্য অনুরোধ করতাম এরপর তিনি আমাদের খবরাখবর নিতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদের মধ্যেও এই পুণ্যসমূহ প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

দ্বিতীয় জানাযা যার পড়াব তার নাম হচ্ছে মোকাররম আকমিদ আগ মুহাম্মদ সাহেব, যিনি বুরকিনা-ফাসোর ডোরির রিজিওনের মাহদিয়াবাদ জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সম্প্রতি ৬৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন,إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি তার অবর্তমানে দুই স্ত্রী, দশ পুত্র এবং পাঁচ কন্যা রেখে গেছেন। মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেছেন, খুব চটপটে, কর্মঠ মানুষ ছিলেন। আমি সম্প্রতি সেখানে গিয়েছিলাম। ডোরির শহীদ পরিবারগুলোকে তিনি নিজে তাদের ঘর বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন; জামা'তের পক্ষ শহীদ পরিবারগুলোকে নতুন ঘর তৈরি করে দেয়া হয়েছে, তিনি নিজে সেখানে তাদেরকে গুছিয়ে দিচ্ছিলেন। দুদিন পর নিজের বাড়িতে যান, গুরুতর হার্ট অ্যাটাকের কারণে সেখানে অচেতন হয়ে পড়ে যান এবং তার মৃত্যু হয়। ১৯৯৯ সনে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। আহমদী হবার পর হিজরত করে মাহদিয়াবাদে ইব্রাহীম বিদিগা সাহেবের কাছে চলে যান এবং তার সাথে আশপাশের গ্রামগুলোতে তবলীগের জন্যও যেতেন। তবলীগ করে তিনি বহু জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বন বিভাগের ফরেস্ট গার্ডের একজন প্রতিনিধি হিসাবে সরকারী চাকরি করতেন। সেখানে সন্ত্রাসের কারণে অবসরে চলে যান। ফসল কাটা হলে সকল সদস্যদের ফসলের হিসাব করে যাকাতের অংশ আদায় করতেন এবং নিজে তা সেক্রেটারি মালের কাছে পৌঁছে দিয়ে রসিদ কাটাতেন। মাহদিয়াবাদ জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসাবে পাঁচ বছর সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। নম্র এবং শান্তশিষ্ট স্বভাবের মানুষ ছিলেন, কখনো রাগ করতেন না। ১১ জানুয়ারি ২০২৩ সালে যখন সন্ত্রাসীরা আক্রমণ করে সেদিন তিনি মাগরিবের নামায পড়ে নিজ বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন।

এই ঘটনার পর জামা'তের সদস্যদের মাঝে অনেক ভয়ভীতি ও আতঙ্ক বিরাজমান ছিল আর শাহদাতের কারণে মানুষ অনেক আতঙ্কগ্রস্ত ছিল। তিনি তাদেরকে অনেক সাহস যুগিয়েছেন। আর দ্বিতীয়বার আমি যখন তাকে মাহদিয়াবাদের লোকদেরকে ডোরি শহরে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য বলি তখন তিনি কঠোর পরিশ্রম করে সব কাজ সম্পন্ন করেছেন। তিনি মানুষদেরকে অভয় ও উৎসাহ দিয়েছেন। জামা'তের সদস্যদেরকে নিজ তত্ত্বাবধানে ডোরিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত শহীদ পরিবারগুলোর প্রয়োজনের খেয়াল রাখতেন।

ডোরির মুবাল্লিগ রানা ফারুক সাহেব বলেন, ফজর নামায শেষে প্রত্যহ শহীদদের পরিবারের সদস্যদেরকে সালাম দেবার জন্য যেতেন আর খোঁজখবর নিতেন। কোনো সমস্যা হলে দ্রুত তার সমাধান করার চেষ্টা করতেন। তিনি বলেন, এখন ডোরিতে বিভিন্ন জামা'তের সমস্যাকবলিত প্রায় আটশর মতো মানুষ রয়েছে, তাদের সবার দেখা করতেন। সর্বদা তাদের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন।

নামাযে ছিলেন খুবই নিয়মিত এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতাকারী ছিলেন; অন্যদেরকেও এর উপদেশ দিতেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন, তার সন্তানদেরকে ও আত্মীয়স্বজনদেরকে ধৈর্য দান করুন আর তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক কর্তৃক অনূদিত)